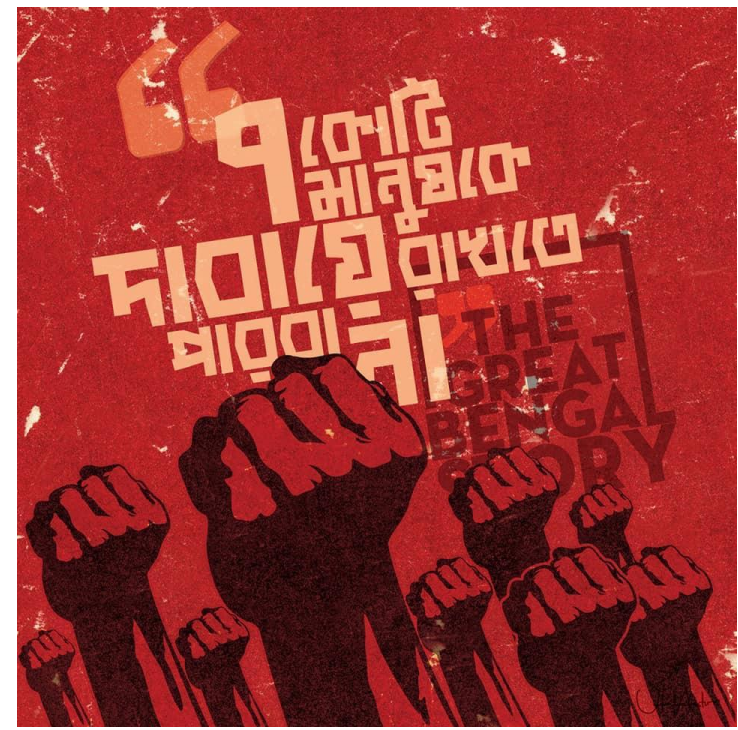


পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন
ও বাঙালির চুড়ান্ত বিজয়



সৈয়দ নাজিমুর রহমান সোহেল
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

আজকের আলোচনা শেষে তোমরা জানতে পারবে-

১. গেরিলা যুদ্ধ কী?
২. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কেন মহান মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল?
৩. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অভিযানের বিবরণ দাও।
৪. অপারেশন জ্যাকপট কী?
৫. অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে পরিচালিত আক্রমণের বিবরণ দাও।
৬. অপারেশন কিলো ফ্লাইট কী?
৭. অপারেশন কিলো ফ্লাইটের প্রস্তুতি, পরিচালনার সিদ্ধান্ত ও ফলাফল আলোচনা কর।
৮. মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের জন্য অপারেশন কিলো ফ্লাইট কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
৯. ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন ও বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালি জাতির ওপর নির্বিচারে গণহত্যার যে সূচনা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী করেছিল ১৬ ডিসেম্বর ২৭৬ দিন পর তাদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই পরাজয়ের মাধ্যমে মুহম্মদ আলী জিন্নাহ'র দ্বি-জাতিতত্ত্বের ফসল পাকিস্তানের সমাপ্তি ঘটে, বিজয়ী বাঙালি জাতি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন দেশের জন্ম দেয়।



পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের কারণ

১. গেরিলা যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পাকবাহিনীর বিপর্যয়:

গেরিলা যুদ্ধ এমন এক ধরনের যুদ্ধ পদ্ধতি যেখানে ভূমি এবং ভৌগোলিক সুবিধা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করা হয়। গেরিলাযুদ্ধ অনেক সময়েই দুর্গম বন-জঙ্গল এলাকায় হয়ে থাকে। গেরিলারা যুদ্ধে জয় ও মোকাবেলা করার জন্য সামরিক বাহিনীকে অনেকরকম সামরিক কৌশল ব্যবহার করে, যেমন অতর্কিত আক্রমণ, হানা, ক্ষুদ্র যুদ্ধ, হিট এবং রান কৌশল, ইত্যাদি।



পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের কারণ



মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ



মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা আক্রমণ

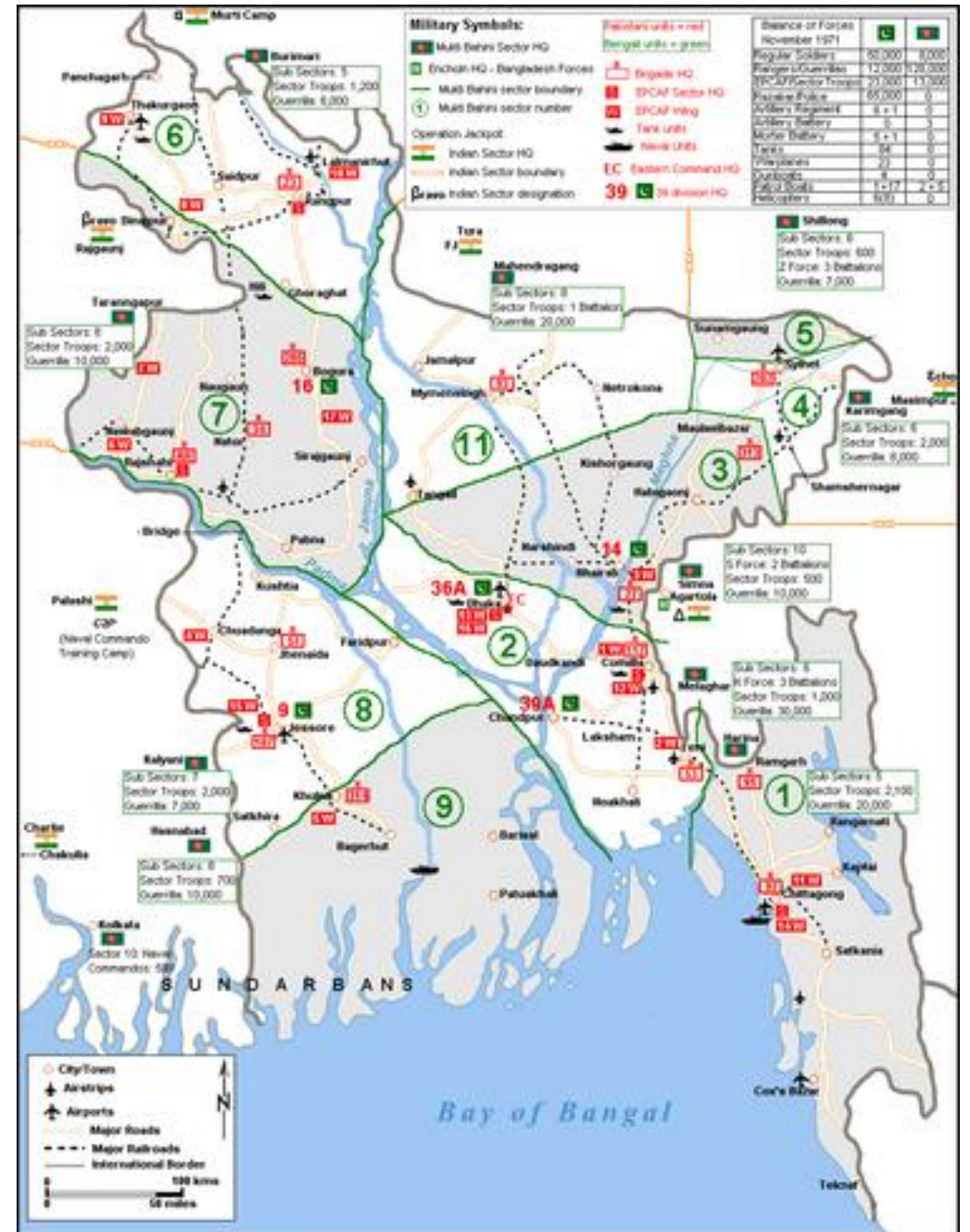
২৬ মার্চ থেকে বাঙালি যুবক, তরুণ, ইপিআর (East Pakistan Rifles), সেনাবাহিনী ও পুলিশের অপরিকল্পিত প্রতিরোধ জুন মাস থেকে সেক্টরভিত্তিক যুদ্ধের ফলে সুসংগঠিত হয়। ভারত থেকে আগত ও স্থানীয় ভিত্তিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গেরিলারা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের ওপর আক্রমণ চালালে তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের কারণ



অক্টোবরের শেষ নাগাদ মুক্তিবাহিনীর হাতে পাকবাহিনীর ২৩৭ জন অফিসার, ১৩৬ জন জেসিও (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার) এবং অন্যান্য শ্রেণীর ৩,৫৫৯ জন সৈন্য নিহত হয়। এছাড়া অগণিত এদেশীয় দোসর মারা যায়। নভেম্বর থেকে স্থল যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী অনেক এলাকা শত্রু মুক্ত করে। ভারত সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু করলে এক সপ্তাহের বেশি পাকবাহিনী টিকে থাকতে পারেনি।

২. নৌ-কমান্ডোদের আক্রমণ ও নৌপথে অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ সমস্যা: স্থল যুদ্ধে পাকবাহিনীর বিপর্যয়ের পাশাপাশি বাঙালি নৌ-কমান্ডোরা আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে সমুদ্র উককূলবর্তী এলাকা, নদী ও সমুদ্র বন্দরে ব্যাপক অভিযান চালায়। অপারেশন জ্যাকপট ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নৌ-কমান্ডোরা বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে অত্যন্ত অল্প সময়ে যুদ্ধের গতি সম্পর্কে বিশ্বকে ধারণা দিতে সক্ষম হয়। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পরিচালিত নৌ-কমান্ডো বাহিনীর প্রথম অভিযান ‘অপারেশন জ্যাকপট’ নামে পরিচিত। এদিন রাতে নৌ-কমান্ডোরা একযোগে মংলা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর আক্রমণ করে এবং পাকিস্তান বাহিনীর ২৬ টি পণ্য ও সমরাস্ত্রবাহী জাহাজ ও গানবোট ডুবিয়ে দেয়।



মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধাঞ্চলকে যে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয় এর মধ্যে ১০নং সেক্টরের অধীনে ছিল নৌ-কমান্ডো। মূলত সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, নদী ও সমুদ্র বন্দরসহ বাংলাদেশের সমগ্র জলপথ নিয়ে এ সেক্টর গঠিত হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে পাকিস্তানের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া ছিল নৌ-কমান্ডো আক্রমণের উদ্দেশ্য।



১৫ আগস্ট রাত ১২ টায় অপারেশন জ্যাকপট শুরু হয়। কমান্ডোরা জাহাজে মাইন সংযোজন করে ফেরত আসেন। কিছু মাইন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিস্ফোরিত হয়। ১৫ আগস্ট রাত ১-৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বন্দর প্রকম্পিত হয়।

বন্দরে এম.ভি হরমুজ এবং এম.ভি আল-আব্বাস নামে দুটি পাকিস্তানি জাহাজসহ বেশ কয়েকটি বার্জ ও জাহাজ ধ্বংস হয়। এম.ভি হরমুজে ৯৯১০ টন এবং এম.ভি আল-আব্বাসে ১০,৪১৮ টন সমর সরঞ্জাম ছিল। সাবমেরিনার আহসানউল্লাহর (বীরপ্রতীক) নেতৃত্বে ৪৮ জন নৌ-কমান্ডো মংলা বন্দরে অভিযান করেন। বন্দরের ৬ টি জাহাজ মাইনের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। চাঁদপুর নদীবন্দর অভিযানে সাবমেরিনার বদিউল আলমের (বীরউত্তম) নেতৃত্বে ২০ জন নৌ-কমান্ডো সফল হন। তাঁরা ১৫ আগস্ট রাতে একই সময় চাঁদপুর বন্দরে মাইন দ্বারা কয়েকটি জাহাজ ধ্বংস করেন। সাবমেরিনার আবদুর রহমান (বীরবিক্রম) ও শাহজাহান সিদ্দিকের (বীরবিক্রম) নেতৃত্বে ২০ জনের কমান্ডো দল নারায়ণগঞ্জ ও দাউদকান্দি নদীবন্দরে সফল অভিযান পরিচালনা করে।

পাকিস্তান সরকার অপরূদ্ধ বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে বলে বহির্বিশ্বে যে প্রচারণা চালায় নৌ-কমান্ডোদের সফল অভিযানের মাধ্যমে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের নৌ-অভিযানের খবর ফলাও করে প্রচারিত হয়। এরপর থেকে কোনো বিদেশি জাহাজ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসতে রাজি হয় নি। অপারেশন জ্যাকপটের কারণে মুক্তিযুদ্ধ বহির্বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

মুক্তিযুদ্ধে বড় ধরনের ৪৫টি অভিযানে ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হলে পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। তাই সেপ্টেম্বর থেকে চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরে কোনো বিদেশী জাহাজ আসতে রাজী হয়নি। এতে পাকবাহিনীর অস্ত্র ও রসদ সরবরাহে সংকট দেখা দেয়।

৩. বিমান বাহিনীর আক্রমণ (অপারেশন কিলো ফ্লাইট): পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করার লক্ষ্যে বিমানবাহিনী বৈমানিক অভিযান পরিচালনা করে। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে তাঁদের এই সমন্বিত অভিযান গুলো অপারেশন কিলো ফ্লাইট নাম পরিচিত।

অপারেশন কিলো ফ্লাইটের প্রস্তুতি: ভারত সরকারের দেওয়া বিমানগুলো বেসামরিক হওয়ায় সেগুলোকে সামরিক বিমানে পরিণত করার কাজ শুরু হয়, যা ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এ অটার প্লেন এবং অ্যালুয়েড হেলিকপ্টারে পাখার নিচে সংযোজন করা হয় ২টি করে রকেট পড। এ রকেট পডগুলোতে ৭টি করে মোট ১৪টি রকেট বহন করা যেত। একইসঙ্গে এই ২টি বিমানে ছিল ভারি মেশিনগানের ব্যবস্থা। অটার বিমানের তলদেশে ২০ পাউন্ড ওজনের ২০টি বোমা বহনের ব্যবস্থা করা হয়।

ডাকোটা বিমানটিকে ১ হাজার পাউন্ডের মোট ৫টি বোমা বহনের উপযুক্ত করা হয়। ঠিক করা হয়, প্রতিটি বিমানেই থাকবেন ৩ জন করে পাইলট। এর মধ্যে ১ জন স্ট্যান্ডবাই। যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোনো পাইলট আহত বা অসুস্থ হলে তখন তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। একইসঙ্গে থাকবেন একজন করে গানার। কিন্তু বেসামরিক বিমানগুলোকে সামরিক বিমানে পরিণত করার ক্ষেত্রে ছিল নানা বিপত্তি।



মুক্তিযুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানসমূহ



অপারেশন কিলো ফ্লাইট পরিচালনার সিদ্ধান্ত: কিলো ফ্লাইটের অপারেশনগুলো রাতে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ ও নিরাপত্তা বিবেচনা। দিনে আক্রমণ চালালে পাকিস্তানের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ও মিসাইল ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হতো অপারেশন কিলো ফ্লাইটকে। তাই মধ্যরাতে অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

কিলো ফ্লাইটের অপারেশনগুলো রাতে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর প্রতি-আক্রমণ ও নিরাপত্তা বিবেচনা। দিনে আক্রমণ চালালে পাকিস্তানের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান ও মিসাইল ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হতো অপারেশন কিলো ফ্লাইটকে। তাই মধ্যরাতে অপারেশন চালানোর সিদ্ধান্ত হয়।

অপারেশন কিলো ফ্লাইট পরিচালনা: ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের ৭টি ঘাঁটিতে একযোগে বিমান হামলা চালালে ভারত সরকার মুক্তিবাহিনীর এয়ার উইংকে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুসারে অপারেশন শুরুর নির্দেশ দেয়। একইসঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গক যুদ্ধ ঘোষণা করে।



সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলের ইউএসএসওর তেলের ডিপোতে প্রথম অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ এবং ফ্লাইং অফিসার বদরুল আলমকে। আর দ্বিতীয় অপারেশনে পতেঙ্গার ইন্টার্ন রিফাইনারিতে হামলা চালাতে বরা হয় ক্যাপ্টেন আকরাম আহমেদ এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলমকে।

অপারেশন কিলো ফ্লাইটের ফলাফল: কিলো ফ্লাইটের এই ২টি অপারেশনে ধ্বংস হয়ে যায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বেশিরভাগ জ্বালানি তেল। ফলে জ্বালানি তেলের অভাবে উড়ার শক্তি অনেকটাই হারিয়ে ফেলে পাকিস্তানি বাহিনী। অনেকাংশেই মুক্ত হয়ে যায় বাংলার আকাশ। প্রথমদিকে মুক্তিবাহিনীর বিমান উইংয়ের ঘাঁটি ভারতের নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে থাকলেও পরে তা শমসেরনগরে স্থানান্তর করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী ১৩ দিনে অপারেশন কিলো ফ্লাইটের মাধ্যমে অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার ও অটার বিমান নিয়ে ৭০টি অপারেশন চালিয়েছিলেন কিলো ফ্লাইটের মুক্তিযোদ্ধারা।



Attack on Narayanganj Fuel Depot by Kilo Flight Helicopter



Operation Kilo Flight – Night Attack By Otter Aircraft

৪. যৌথ কমান্ড গঠন ও পাকবাহিনীর পশ্চাদপসরণ: মূলত মধ্য নভেম্বর থেকে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্তভাবে প্রবেশ করতে থাকে। ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথ কমান্ড গঠন করে। মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরার অধিনায়কত্বে বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে ৪টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। যৌথ কমান্ড গঠন ইয়াহিয়া খানকে ভাবিয়ে তোলে। ১৬ ডিসেম্বর এই যৌথ বাহিনীর কাছেই পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করে।



৫. বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সফল কূটনৈতিক উদ্যোগ : বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবগত করতে বিভিন্ন মিশন প্রেরণ করে। ভারত ছাড়াও ৪টি মিশনসহ ১১টি প্রতিনিধিত্বকারী দপ্তর মুজিবনগর সরকার স্থাপন করে। অক্টোবরে জাতিসংঘে আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সমর্থনসূচক বিবৃতি আদায়ে সক্ষম হন।



লন্ডনে হাউসপার্ক জন্মসমাবেশে বক্তৃত্যরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ১৯৭১।



জাতিসংঘের ৪৭টি সদস্য দেশ বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখার ফলে ৮ নভেম্বর মার্কিন সরকার পাকিস্তানের অর্থ নিষেধাজ্ঞা বিল পাস করে। এরপর জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে অনেক দেশ সমর্থন দেয়। অন্যদিকে ভারত সরকার মে মাস থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরন সিংসহ উচ্চপদস্থরাও বিদেশ সফর করেন। এভাবে বিভিন্ন দেশে সফল কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে পাকিস্তান অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এরপর পাকিস্তান ক্রমান্বয়ে যুদ্ধবিরতির লক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়।



চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের (বামে) সাথে
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন

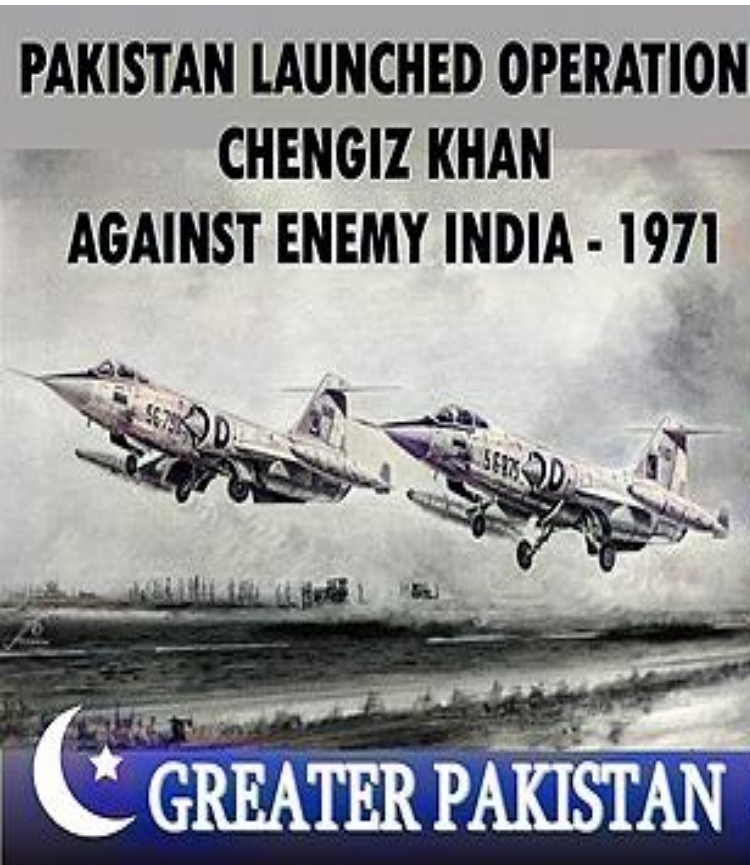


ইয়াহিয়া খানের সাথে
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন



১৯৭১ সালে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ-এর সাথে
কূটনৈতিক আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

৬. ভারতের সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান: পাকিস্তানি বিমানবাহিনী অতর্কিতে ৩ ডিসেম্বর অপারেশন চেন্গিস খান পরিচালনা করে বিভিন্ন ভারতীয় বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ। ভারত সার্বভৌম দেশ হিসেবে ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।



মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে বিপর্যস্ত পাকবাহিনী



- এর ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ৮-৯ ডিসেম্বর কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী শহর যৌথ বাহিনীর দখলে আসে। যশোর, চাঁদপুর, সিলেট, দাউদকান্দি ও ফেনীর বিস্তীর্ণ এলাকা যৌথ বাহিনীর অধিকারে আসে।
- ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল (বর্তমান হোটেল শেরাটন) নিরপেক্ষ এলাকা ঘোষণা করে কূটনৈতিক ও বিদেশী নাগরিকদের আশ্রয় দেয়া হয়। বিশেষ বিমানযোগে ঢাকা থেকে ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী নাগরিক অপসারণ করা হয়।
- ১১-১২ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ, হিলি, কুষ্টিয়া, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, সিরাজগঞ্জ মুক্ত হলে যৌথ বাহিনী ঢাকা দখলকে প্রাধান্য দেয়। ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় বিমান হামলা অব্যাহত রাখে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ



বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়

- ন'মাসের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়ে বাঙালি জাতির জীবনে ১৬ ডিসেম্বর নতুন প্রভাত নিয়ে আসে। লে. জেনারেল নিয়াজির নির্দেশে ভোর পাঁচটা থেকে যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। বেলা ১টা নাগাদ ঢাকা এসে পৌছেন যৌথ বাহিনীর অধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরা ও চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার।



বাঙালির চূড়ান্ত বিজয়

- ওইদিন পৌণে ৫টায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন।
- ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মোট ৯১,৬৩৪ জন সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এদের মধ্যে ৭৪,৮৫৬ জন সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য ও তাদের পোষ্য এবং ১৬,৫৪৫ জন বেসামরিক সদস্য, তাদের পোষ্য ও অন্যান্য।



পাকিস্তানের আত্মসমর্পন



১৯ ডিসেম্বর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পন